একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

The past and present of education in Amalendu Chakraborty's Short-stories

অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান

Name of the Author: Purabi Howlader

Affiliation: Recharch Scholer, Bengali Department,
Kalyani University, West Bengal, India

Abstract: Amalendu Chakraborty is a powerful writer of the second half of the last century and a less discussed writer. This writer's stories and novels were not published in major commercial magazines. That is why his stories and novels are still unread by many. He himself was a teacher. As a result, the education system is mentioned in many of his stories. Among them, I have chosen the two stories 'Panchasti Manabashishu Ekojan Devdoot' and 'Prajapaticharchar itibrittya' as the subject of my discussion. In both stories, the storyteller has shed light on the infrastructure of the education system. It is seen that even after the twentieth century and the twenty-first century, the environment of the education system has not change

Keywords: Amalendu Chakraborty, Education, Corruption, Light of hope

অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পে শিক্ষার অতীত ও বর্তমান

পূরবী হাওলাদার

অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪২০০৯খ্রী:) গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অত্যন্ত শক্তিমান লেখক, তেমনই অত্যন্ত কম আলোচিত লেখক। বাংলা কথাসাহিত্যের অবাণিজ্যিক ধারার পুরোধা বলা যায় অমলেন্দু চক্রবর্তীকে। এই লেখকের গল্প-উপন্যাস প্রধান বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশিত হত না। যদিও 'দেশ' পত্রিকাতে কখনো কখনো প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প। কিন্তু তথাপি তিনি নিজস্ব ধারণায় এবং শিল্পসাধনায় অনড় ছিলেন। এইকারণেই বাণিজ্যিক ধারার কথাসাহিত্যিক যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্প-উপন্যাস এখনও অপঠিত অনেকের। 'গোষ্টবিহারীর জীবনযাপন', 'যাবজ্জীবন', 'আকালের সন্ধানে', 'রাধিকাসুন্দরী'র লেখককে চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কাছে পরিচিত করে দিয়েছিলেন মৃণাল সেন। লেখকের দুটি কাহিনির চিত্ররূপ দিয়েছিলেন তিনি। একটি 'আকালের সন্ধানে' আর অপরটি 'অবিরত চেনামুখ'।

আমরা জানি অমলেন্দু চক্রবর্তী নিজে ছিলেন শিক্ষক। ফলে তাঁর বহু গল্পে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাব্যবস্থার কথা উঠে এসেছে। যার মধ্যে দুটি গল্পকে আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় হিসাবে আমি বেছে নিয়েছি। একটি বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে লেখা 'পঞ্চাশটি মানবশিশু একজন দেবদূত', অপরটি একবিংশ শতাব্দীতে লেখা 'প্রজাপতিচর্চার ইতিবৃত্ত'। দুটি গল্পেই শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোর দিকে আলোকপাত করেছেন গল্পকার। দেখা যাচ্ছে বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শিক্ষাব্যবস্থার পরিবেশটি পাল্টায়নি। এই দুটি গল্পের সারাশরীরে যেন লেগে আছে শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির দাগ।

পঞ্চাশটি মানবশিশু একজন দেবদূত:

'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৬৯-এর মে মাসে বের হয় এই গল্পটি। গল্পটিতে সেই সময়ের স্কুলের পরীক্ষাব্যবস্থা কত ভেঙে পড়েছিল তার চিত্র আছে। কলকাতার একটি স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হচ্ছে। একটি হলে একসঙ্গে ৫০জন ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে। আর গার্ড দিচ্ছেন একজন শিক্ষক প্রণবেশ মুখোপাধ্যায়। প্রণবেশের সঙ্গে আরেক জন অঙ্কের শিক্ষকের গার্ড দেবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি গল্পের শেষপর্যন্ত আসেননি। কারণ তিনি প্রাইভেটটিউশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্কুলের সামনেই এই অঙ্কের শিক্ষক নির্মল চৌধুরির ভাড়াবাড়িতেই সুবিশাল শিক্ষা কারখানা। যেখানে সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি তিনটি সিফটে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী পড়তে যায়। ফলে প্রণবেশবাবুকে এই হলে একাই কাটাতে হল। তাই স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার সময়ে এক একটি হল হয়ে উঠত এক একটি রণাঙ্গণ। ছাত্রছাত্রীরা প্রণবেশবাবুকে একেবারে নাজেহাল করে দিয়েছিল।

'কোশ্চেনে হেভি টাইট দিয়েছে স্যার...'

'কমন পাইনি।'

'আউট অব সিলেবাস।'

'স্যার বলুন, একটু আধটু ছাড়ুন। নইলে গোলমাল হবে...'

'স্যার...'[১]

প্রণবেশের অবস্থা হয়েছে চক্রব্যূহের মধ্যে নিরস্ত্র জয়দ্রথের মত যেখান থেকে সে চাইলেও বেরোতে পারছে না। এই চক্রব্যুহে তাকে একা রেখে গেছে নির্মলবাবু। এখানে দেখতে পাব শিক্ষার বাণিজ্যিকরণের রীতিটিকে। নির্মলবাবু স্কুলের দায়িত্ব এড়িয়ে চলে গেছে প্রাইভেটটিউশনে পড়াতে। কারণ সেখানে সে উপরিইনকাম করছে। শিক্ষাকে সে টাকার অংকে বিচার করছে। তাই স্কুলের থেকে প্রাইভেট টিউশনের দিকেই তার বেশী নজর। শিক্ষক তাকে শুধু একটা পেশা হিসাবেই সে দেখেছে। আবার দেখা যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা বলছে 'আমাকে পারমিট দিতে হবে।' এই পারমিট চাওয়ার অর্থ হল পাশ সার্টিফিকেট চাওয়া। অর্থাৎ ছাত্ররা শিক্ষিত হতে চায় না, চায় শুধু সার্টিফিকেট যা তাদের বাজারদর বাড়াবে। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু ছেলে-মেয়ে যারা লিখছিল তারাও অন্যদের চিৎকারে সন্ত্রস্ত হরিণের মত ঝিম মেরে আছে শ্বাপদ শঙ্কায়। এদেরই মধ্যে প্রণবেশ এমন একজন শিশুকে খুঁজছে যে একেবারেই সরল। আরেকটি জায়গায় আমরা শিক্ষার বাণিজ্যিকরণের চিত্র পাই। পরেশবাবু একটি ছেলেকে

টুকতে দেখে তার কাছ থেকে তারই লেখা বই পেয়ে খুশি হয়ে বলে- "দেখেছেন? দেখছেন মশাই, বইটা কি দেদার চলছে। একেবারে হট-কেক। কিন্তু হারামি পাবলিশার্স, শালা এক নম্বরের খচ্চর, কিছুতেই হাত ওল্টায় না। টাকা চাইলেন শালারা..."[২] স্কুলকমিটির সেক্রেটারি রাঘব বাগচী প্রণবেশকে অভয় দেয় যে, স্কুলের বাইরে মেইন গেটে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। প্রণবেশের তখন জেদ বেড়ে যায়, সে বলে- "পুলিশ দিয়ে চারদিক ঘিরে না রাখলে আমরা ওদের সামনে দাঁড়াতে পারি না, না রাঘববাবু? রাইফেল উঠিয়ে থাকলে আমাদের সাহস বাড়ে।"[৩]

প্রণবেশ তখন উত্তেজিত হয়ে যায়। শিকাড়ি মাছরাঙার মত সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থেকে টুক করে একটি ছাত্রকে নকল করতে ধরে ফেলে। ছেলেটি প্রণবেশের কাছে দয়া ভিক্ষা করে এবং তার সঙ্গে অন্যরাও লেখালিখি ছেড়ে প্রণবেশের দিকে উন্মুখ হয়। প্রণবেশ দেখে ছেলেটির নাম পরেশ বাগচী। ঘটনাচক্রে তাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের নামও পরেশ। প্রণবেশ ভাবে হয়তো প্রণবেশ নামেও কেউ আছে এখানে। তখন তার মগজে ভিন্ন এক ঝড় উঠতে লাগলো। তিনি ভাবছেন তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী শোভার কথা। শোভা জন্ম দেবে কি এমনই কোনো ছেলের? তিনি ব্যাকুল হয়েছেন এই রণাঙ্গনের ভদ্র, সাধারণ দুর্বল কয়েকজন ছাত্রের জন্য—যারা কোন অসদুপায় করছে না। এই যুদ্ধে তারাই যেন আজ হেরে যাচ্ছে। তিনি তাদের মধ্যে একটি ছাত্রের কানের কাছে গিয়ে বলেন- "লেখ বাবা, লেখ। ট্র্যানস্লেশনটা টুকে নে চটপট, ওপিঠে প্রেসিটাও আছে। কোনো ভয় নেই। আমি আছি, আছি তোর পাশে....."[৪]

পরীক্ষাহল যেন এক হিংস্র অরণ্য। এখানে ছাত্রকে উত্তর বলে দেওয়ার মধ্যেই এই হিংস্রতার শরিক হয়ে গেছে যেন প্রণবেশ ও সেই ছাত্রটি। এখানে কোন সৎ উপায় কাজ করে না - এখানে সবই অসৎ। প্রণবেশ কিন্তু এই অসদুপায়ের স্রোতে একেবারে ভেসে যেতে পারেননি। কয়েকটি উত্তর বলে দিয়ে মিনিট তিনেক আগেই তিনি ছেলেটির খাতা কেড়ে নিয়েছেন। ছেলেটির বহু কাকুতিমিনতিতেও ভেঙে পড়েননি তিনি। শেষপর্যন্ত তিনি গিয়েছেন একটি দুর্বল ছাত্রের কাছে – যার খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় কিছুটা অক্ষম প্রয়াস ছিল বাকিটা প্রায় সাদা। তারপর আরেকটি ছাত্রের কাছে। অন্যদিকে 'লুণ্ঠনত্রাসে পরাক্রান্ত যারা' গোটা পরীক্ষার হল তারা ভরিয়েছে অট্টহাস্যে। পরীক্ষাটা এদের কাছে অট্টহাস্যে ভরা তিনঘন্টার খেলামাত্র। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের উপর নির্ভর করে নেই তাদের জীবন। তাদের ঈশ্বর এক বা একাধিক রাজনৈতিক নেতা। প্রণবেশ এতসব বোঝে না। কোন রাজনৈতিক নেতার কাছে তাঁর টিকি বাঁধা নেই। তাই লেখকের মতে তার কোন ঈশ্বর নেই তিনি নাস্তিক। এভাবে পরীক্ষার হলের তিনঘণ্টা সময়কে গল্পের বিষয় করে সমকালের শিক্ষাব্যবস্থার হালকে অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন গল্পকার এই গল্পে।

প্রজাপতি চর্চার ইতিবৃত্ত:

'পরিকথা' থেকে ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'প্রজাপতি চর্চার ইতিবৃত্ত' গল্পটি। গল্পটি কোলকাতা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের। পরিবারের কর্তা দীপঙ্কর, তার স্ত্রী অনিমা, তাদের ছোট্ট কন্যাসন্তান এবং বৃদ্ধ বাবা মা হৃষীকেশ ও আরতি। দীপঙ্কর ও অনিমার কন্যাসন্তানের ইংরেজি স্কুলে পড়া এবং ইংরেজি শেখাতে গিয়ে সকলের যে হয়রানি হয়েছে তাই নিয়ে লেখা গল্পটি। আপাতভাবে একটি পরিবারের কাহিনি মনে হলেও এটি আসলে প্রত্যেকটি মধ্যবিত্ত মানসিকতার এবং পাশ্চাত্যের ভাবধারায় চালিত পরিবারের কাহিনি।

বিগত প্রায় ষাট বছরের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাপনের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তনের চেহারা লক্ষ্য করা গেছে আট-নয় দশকে। যার সূচনা হয় সাতের দশকে। দু'হাজার সালের প্রথম দশকে এই রূপান্তর দ্রুত বিস্তার লাভ করে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর চাল চলনে, মননে, পোষাক-পরিচ্ছেদে, রুচিতে এই পরিবর্তনের চিহ্ন এখন স্পষ্ট। আলোচ্য গল্পটি ২০০২ সালে লিখিত হয়েছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ম ঔপনিবেশিকতার গর্ভে। ইংরাজ রাজত্বে। নিজেদের শাসন অক্ষুন্ন রাখতে দরকার ছিল দেশীয় এমন একটি অনুগত শ্রেণী, যারা প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করবে। যারা হয়ে থাকবে আজ্ঞাবহ। সেইকারণেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা বা আচারব্যবহারের পরিবর্তে ইংরেজি কালচারকে ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল বৃটিশ শাসকদের কাছে একান্ত জরুরি। শাসিতদের সামাজিক সত্তার পুরনো শিকড় ও

পড়ানোর প্রচেষ্টা শুরু - ইংরেজিশিক্ষার প্রসার। ইংরেজির দ্রুত প্রসার যে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল, পাশ্চাত্যের জীবন তার কাছে হয়ে উঠেছিল ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন। প্রতিদিনের জীবনযাপনে তার রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাল্টে গেছে মানুষের রুচি। দেশীয় পুরাণের থেকে বিদেশী Novel মানুষকে এখন বেশী আকর্ষণ করে।

অমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর 'প্রজাপতি চর্চার ইতিবৃত্ত' গল্পটিতে এইরকমই এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানকে ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত করবার কঠিন প্রচেষ্টার কাহিনি তুলে ধরেছেন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। গল্পকার প্রজাপতিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন গল্পটিতে। একটিমাত্র ইংরেজি শব্দের মানে খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে গোটা পরিবার হিমসিম খাচ্ছে। একজন বুড়ো মানুষ রাতদুপুর অবধি ঘরে ফিরছে না হন্যে হয়ে ঘুরে বেরাচ্ছে শব্দটির মানে খুঁজতে। গল্পে দেখা যাচ্ছে অনিমা ফুলঝাড়ুর লম্বা বাঁশ দিয়ে ছাদের দেওয়ালে বসা প্রজাপতিকে মারতে চাইছে কিন্তু কিছুতেই পারছে না। প্রজাপতি ধরাটা যতোটা শক্ত ঠিক একইরকম শক্ত কাজ যেন 'স্টাডি অব বাটারফ্লাই' এই শব্দটার মানে খোঁজা। এই শব্দের মানে খুঁজতে কম্পিউটার, ডিকশনারি সব ঘাটা হয়েছে তবু পাওয়া যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত অনিমা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ওঠে - "আমি কী করব? বড়বড় ইশকুলের বড়বড় খাঁই। মাসে প্রায় হাজার ছয়েক টাকা ক্লাস ফোরেই খরচা হয়ে যাচ্ছে। তিনটে আন্টি বাড়তি। তা হোক, কেজি থেকে এখন অব্দি দশের নিচে তো রোল নম্বর নামেনি কখনও। এখন যদি দু-পাঁচ নম্বরের জন্য তলায় নেমে যায়?"[৫]

অনিমার কথাতেই তার মানসিকতা ধরা পরে। তার কাছে পরীক্ষায় নম্বর বাড়া কমাটাই বেশী গুরুত্ব রাখে। শেখাটা নয়। এবং দেখা যায় এই নম্বর বাড়ানোর জন্য একটা শব্দের মানে খুঁজতে অনিমা ও তার শাশুড়ী অক্সফোর্ডের লার্নার্স ডিকশনারি, কম্পিউটার ঘেটে তন্নতন্ন করে। এতে কিন্তু আখেরে শিশুটির কিছুই শেখা হয় না মানে যারা খোঁজে তাদেরই শেখা হয়। কোনমতে নাতনির পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়ানোটাই আরতির একমাত্র উদ্দেশ্য। দীপঙ্কর কেবলা তার উক্তিতে তা পরিস্কার হয়-"ছেলেবেলায় তোদের বাড়ি আসার আগে আমাদের তো রেশনের চাল খেয়ে মানুষ হতে হয়েছে। পড়াশুনোর ফাঁকে আমি দিদিমা-র সঙ্গে বসে চালের কাঁকর বাছতাম। অভ্যেসটা দেখছি এখনও রয়ে গেছে।"[৬]

আমরা বাবা মায়েরা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ গড়তে গিয়ে তাদের ইংরেজিস্কুলে পড়াই যাতে ভবিষ্যতে মানুষ হয়। কারণ আমাদের ধারণা জন্মে গেছে যে, দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত হলে বৃহৎ জগতে সে অন্যদের থেকে ইঁদুর দৌড়ে পিছিয়ে পড়বে। এই করতে গিয়ে আমরা তাদের শৈশবকেই গলা টিপে মেরে ফেলি। তাই তাদের আর ঠাকুমার নাড়ু, মোয়ায় রুচি নেই। তাদের চোখ চকলেটের দিকে। ভালো লাগে না দাদুঠাকুমার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি বা রাম-রাবণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, তাদের চোখের সামনে এখন কার্টুন। রূপকথার গল্প তাদের কাছে ননসেন্স স্টোরি। আমাদের দেশের শিশুরা সব বিদেশী শিক্ষার চমৎকারিত্বে বহিরাবরণে সুন্দর হচ্ছে, আদবকায়দা শিখছে এবং বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। স্বদেশ তাদের আর ভালো লাগে না। দেশে জন্মে তারা দেশের জন্য কিছু না করে বাড়তি সুবিধার জন্য চলে যাচ্ছে বিদেশে। গল্পকার এই ব্যাপারটাকে প্রজাপতির প্রতীক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আরতি এক জায়গায় বলছে- "মরা হোক, জ্যান্ত হোক; সাহেবদের দেশে বাটারফ্লাইয়ের কী দারুণ ডিমান্ড জানিস? ওরা আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রজাপতি বানাবে কী? আমরাই তো বছরে বছরে লাখো লাখো প্রজাপতি পাঠাচ্ছি ওদের দেশে..."[৭]

অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখন এমন হয়েছে যে আমরা দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার থেকে বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াকে বেশী গৌরবের বলে মনে করছি। বিদেশে আমাদের কার কতো চাহিদা তাতেই আমাদের শিক্ষার মানদন্ড বিচার হয়। আমরা নিজেরা পারি বা নাই পারি যেনতেনপ্রকারে চেষ্টা করি ছেলেমেয়েকে ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলে পড়াতে। নিজেরা না পারলে টিউশন টিচার রাখি গাদাগাদা। আমরা ছেলেমেয়েদের মুখস্থ বুলি শিখিয়ে তোতাপাখী তৈরী করছি, যাতে তাদের স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বয়সের চেয়ে বেশী বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে তাদের থেকে তাদের শৈশবকে কেড়ে নিচ্ছি। হৃষিকেশ তার নাতনির জন্য বহু খেটে না পারা শব্দটির মানে চিরকুটে লিখে আনে। অনিমা সেই কাগজ খুলতে গেলে হৃষিকেশ বলে-"নানা, ও-চেষ্টাটি করোনা। ও তুমি পারবে না, আমি পারব না। অনেক লম্বা শব্দ। আমরা কেউই উচ্চারণ করতে পারব না। কিন্তু কাল তো রোববার। কাল দুপুরবেলা বসে মুখে মুখে অক্ষরগুলো মুখস্থ করিয়ে দেব দিদিভাইকে। পরশু খাতায় লিখে দিয়ে আসবে। পরীক্ষায় দুটো নম্বর খোয়াবে কী? তাহলে আমরা গার্জিয়ানরা কী করছি? মুখ্যু নাকি সব?"[৮]

হৃষিকেশ এই অজানা শব্দের মানেটি যার কাছ থেকে এনেছে তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি তার বিদেশে থাকা ছাত্রের কাছ থেকে ফোনে মানেটা জানতে পারে যেটা সে কম্পিউটার নামক যন্ত্র থেকে বের করে বলেছে। অর্থাৎ যে শিশুটি শিখবে সে তো জানেই না এমনকি তাকে যারা শেখাবে তারাও সেটা মেশিন থেকে ধার করে বলছে। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান হাল। আবার এই ধার করা জ্ঞান নিয়েও অহংকারের শেষ নেই আমাদের। সন্তানকে বিদেশী ভাষার দ্বারা দীপঙ্কর ও অনিমা শিক্ষিত করছে আর তার দেশের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়ছে এবং তা দেখে দাদু হৃষিকেশ আনন্দ করে বলছে বউমাকে।

"তোমার মেয়েতো এখনই বলে – ইন্ডিয়া ইজ ডার্টি। সে আমেরিকা যাবে – গোল্ডেন ল্যান্ড।"[৯]

বর্তমানে সমাজে শিক্ষার যে পরিস্থিতি সেটাকেই অমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর এই 'প্রজাপতি চর্চার ইতিবৃত্ত' গল্পটিতে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি হৃষিকেশকে দিয়ে বলিয়েছেন 'এযাত্রায় আমেরিকাই তো বাঁচাল ওকে' অর্থাৎ তার নাতনিকে। তাই বিদেশী ভাষার ঋণশোধ করতে গিয়ে আমাদের দেশের সন্তানরা দেশের প্রতি কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে। যেমন হৃষিকেশের নাতনি ভারতবর্ষকে নোংরা বলছে, এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে একদিন সমস্ত শিশুরাই তাই শিখবে ও বলবে। বাবামাকে সন্তান যদি সমস্ত শিক্ষায় দীক্ষায় ছাপিয়ে ওঠে তাহলে তার জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। হৃষিকেশের মধ্যে সেই সার্থকতার আনন্দ এসেছে নাতনির সার্থকতায়। দীপঙ্কর হৃষিকেশের কাছে শব্দের মানে লেখা কাগজটি চাইলে তাই হৃষিকেশ আনন্দ করে বলে যে, ঐ শব্দটি পারা দীপঙ্করের বাপেরও সাধ্যি নেই। যা দীপঙ্করের এবং হৃষিকেশের সাধ্যের বাইরে তা তার নাতনি শিখবে এটাই তার কাছে বড় পাওনা। এইভাবে একটি পরিবারের কাহিনির মধ্য দিয়ে সমকালের শিক্ষাব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী অমলেন্দু, অবিরত চেনামুখ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, পৃ. ৭৫।
২. তদেব, পৃ. ৭৮।
৩. তদেব, পৃ. ৮০।
৪. তদেব, পৃ. ৮৩।
৫. চক্রবর্তী অমলেন্দু, গল্পসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা৭৩, পৃ. ২৬১।
৬. তদেব, পৃ. ২৬১।
৭. তদেব, পৃ. ২৬৯।
৮. তদেব, পৃ. ২৭১।
৯. তদেব, পৃ. ২৭৩।